রহমত বুঝল আসলাম জুলেখার ব্যাপারে কথা বলতে আগ্রহী কিন্তু নিজের থেকে আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে চায় না। তাকে যথাযথ প্রশ্ন করে তথ্য বের করতে হবে।

"আমরা জেনেছি আপনার সাথে তার বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে বিয়েটা ভেঙে যায়। বলতে পারেন, সেই ব্যাপারেই একটু বিস্তারিত জানতে এসেছি। কারণটাও একটু ব্যাখ্যা করতে চাই। জুলেখা ভাবীকে মাস খানেক হল কানাডায় নিয়ে গেছে আমার বন্ধু । কয়েক দিনের মধ্যেই সে লক্ষ্য করেছে ভাবীর মধ্যে কিছু অস্বাভাবিকতা আছে। সে এই ব্যাপারে অসম্ভব দুশ্চিন্তায় ভুগছে। আমরা ভাবীর যথাযথ চিকিৎসা করাতে চাই, কিন্তু সব তথ্য জানা না থাকলে সেটা সম্ভব হচ্ছে না। আপনার সাহায্যের আমাদের খুব প্রয়োজন।"

আসলাম মেঝের দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবল। "আমার খবর আপনাদেরকে কে দিল?"

"দৌলত মিয়া। উনি জুলেখা ভাবীর দুঃসম্পর্কের আত্মীয় হন"।

"আচ্ছা, দৌলত চাচার সাথে আপনাদের আলাপ হয়েছে? ওনারা তো দীর্ঘদিন ধরে কানাডা আছেন। আমার আর জুলেখার বিয়ের সময় ওনার সাথে দেখা হয়েছিল। উনি ঘটনাচক্রে সেই সময় দেশে এসেছিলেন।" খানিকটা আপন মনে কথা বলছে আসলাম। রহমত কোন বিঘ্ন ঘটাতে চায় না। সে নীরবে মাথা দোলাল।

আসলাম ঘরের একমাত্র জানালা দিয়ে বাইরে গাছপালার দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ।

"জুলেখাকে আমি এখনও অনেক ভালোবাসি। ওকে প্রথম যেদিন দেখেছিলাম, সেই দিনই বাসায় ফিরে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলাম। ওদিকে একটা কাজে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে বাগানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম ওকে। রুপবতী মেয়ে তো অনেক আছে, কিন্তু এমন অদ্ভুত আকর্ষণ কারো প্রতি কখন অনুভব করি নি। মনে হয়েছিল এই মেয়েটির সাথে আমি জন্ম জন্মান্তর কাটাতে পারব।

"বিয়েটা ধুমধাম করেই হয়েছিল। জুলেখার বাবা মা প্রস্তাব পাবার সাথে সাথেই রাজী হয়েছিলেন। আমরা মেয়ের সাথে কথা বলবার কোন কারণ দেখি নি। আমি তখন সপ্তম আসমানে। আমার মনের মানসীকে পেয়েছি। কত কি পরিকল্পনা ছিল। বউকে নিয়ে হানিমুন করতে সিঙ্গাপুর যাব। তাজমহল দেখতে যাব। আরও কত কি! এতো উত্তেজনায় জুলেখা সম্বন্ধে কোন কিছু জানার চেষ্টা করি নি। কেউ কিছু বলেও নি।

"বিয়ের পর বাসর রাতেই প্রথম বুঝলাম কতবড় ভুল করেছি। বিছানা ভর্তি ফুলের মধ্যে গুটিসুটি হয়ে বসে ছিল। ঘোমটায় মুখ ঢাকা। দরজা লাগিয়ে ওর পাশে গিয়ে বসলাম। নাম ধরে ডাকলাম। মাথা তুলল না। ভাবলাম লজ্জা পাচ্ছে। আদর করে ঘোমটা সরিয়ে দিলাম। মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল জুলেখা।"

চোখ বন্ধ করে সেই দৃশ্যটা যেন মানশ্চক্ষে দেখার চেষ্টা করল আসলাম। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল। "এমন ঠান্ডা, কঠিন মুখ আমি আর কখন দেখি নি। তার দুই চোখে যেন আগুন জ্বলছিল। নাগিনীর মত ফোঁস করে উঠল, '*ছুবি না আমাকে। জানে মেরে দেব*'। ছিটকে পেছনে সরে গেলাম। কল্পনাতেও ভাবিনি এমন কিছু হতে পারে। কিন্তু মাথা ঠান্ডা রাখলাম। বললাম, 'কি হয়েছে জুলেখা? খারাপ লাগছে?' সে ভ্যাংচাল আমাকে। '*জুলেখা? আমি জুলেখা না। আমি চাঁদনী। কি ভেবেছিস, আমি তোর বৌ হব? তোর বাড়ী, ধানের গোলা সব পুড়িয়ে দেব। তোর ফসলের মাঠে বিষ দেব। তোর গুষ্টির*

সবাইকে শেষ করব'।

"আমার ইচ্ছে হচ্ছিল দরজা খুলে দৌড়ে বাইরে পালিয়ে যাই। কি ভেবেছিলাম আর কি হল। কিন্তু বাইরে আমাদের সমস্ত আত্মীয় স্বজনেরা। বিয়ের বাড়ীতে কেউ কি আর ঝট করে ঘুমাতে যায়? এইসব জানাজানি হলে কি আর দশ গ্রামে মুখ দেখান যাবে? আমি জুলেখাকে বললাম, 'তোমার বাবা মা যদি তোমাকে জোর করে বিয়ে দিয়ে থাকেন, তাহলে আমিও এই বিয়ে মানব না। কিন্তু কয়েকটা দিন একটু মানিয়ে চলতে হবে। বাসার অতিথিরা সবাই চলে গেলে আমরা শান্তিতে একটা সমাধান করে ফেলব'। যে কারনেই হোক জুলেখা আমার কথা মেনে নিল। চাঁদনীর ব্যাপারটা আমার মাথায় তখনও ঠিক ঢোকে নি। কেন সে নিজেকে চাঁদনী বলবে আমি বুঝি নি। ধরে নিয়েছিলাম হয়ত সেটা জুলেখার ডাক নাম হবে। অনেকেরই থাকে"।

রহমত নিবিষ্ট মনে শুনছিল। আসলাম ক্ষনিকে জন্য থামতেই সে কৌতূহলী কণ্ঠে বলল, "তারপর কি হল?"

"দুই দিন সে ঘর থেকে বের হল না। কারো সামনে গেল না। আমি সবাইকে বললাম, তার মনটা ভালো নেই। চিন্তার কোন কারণ নেই। কুটুমদের সবাইকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলাম। বাড়ী ফাঁকা হতে বাবা-মাকে বললাম, জুলেখার এই বিয়েতে মত ছিল না। তারা আগের দিনের মানুষ। গুরুত্ব দিলেন না। কিন্তু আমার পক্ষে একটা মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সাথে সংসার করা সম্ভব নয়। আমি জুলেখার বাবা-মাকে ডেকে পাঠালাম। তারা এলেন না। বললেন, জুলেখার কথায় কান না দিতে। সে একটু খামখেয়ালি। বিয়ে নাকি তার মত নিয়েই হয়েছে। তাদের কথা বিশ্বাস না করার আমার কোন কারণ ছিল না। এবং সেটাই ভুল হয়েছিল।"

রহমত ফিসফিসিয়ে বলল, "কি করল জুলেখা?"

মাথা নাড়ল আসলাম। "জুলেখা নয়। চাঁদনী। পরে সবাই আমাকে বলেছে, সে জ্বীন। ছোটবেলা থেকেই জুলেখার শরীরে সে আছর করে আছে। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করবার ক্ষমতা জুলেখার ছিল না। চাঁদনীর কথা আপনারা জানেন?"

"জানি। সেই জন্যেই আপনার কাছে আসা। তার শরীরে অসম্ভব শক্তি। কোন ভয় ভীতি নেই। মনে হয় যেন মানুষের মনের কথা পড়তে পারে। মিজান জীবন হাতে নিয়ে দিন কাটাচ্ছে।"

"তার অবস্থা আমি বুঝতে পারছি," আসলাম বলল। "তিন দিন পরে জুলেখাকে যখন জানালাম তার বাবা আমাকে কি বলেছেন, তখনই আসল সমস্যা শুরু হল। এই বাড়ীতে সে আমার সাথে আটকা পড়ে যাবে, এই সম্ভাবনায় সে ভয়ানক ক্ষেপে গেল। আমাকে বলল, তাকে তার বাবার বাড়ীতে রেখে আসতে। ওর বাবা বললেন, জুলেখার বাড়ী এখন তার শ্বশুর বাড়ী। সেখানেই সে থাকবে। আমি পড়লাম বিপদে। ওর বাবা-মা যদি না চান, তাহলে আমি কি করে সেখানে পাঠাই? চতুর্থ দিন রাতে আমাদের ঘরে দরজা বন্ধ করে তাকে সমস্যাটা খুলে বললাম। তারপর যা হল সেটা ভাবলে আমার শরীর এখনও শির শির করে ওঠে। চাঁদনী আমাকে এতো জোরে ধাক্কা দিল যে আমি ছিটকে দেয়ালে আছড়ে পড়লাম। এগিয়ে এসে আমার চুল ধরে টেনে তুলে দরজার দিকে ছুড়ে দিল। হিস হিস করে বলল, '*কেন বিয়ে করেছিলি আমাকে? এবার মরবি তুই*'। আমি দরজা

খুলে দৌড়ে পালিয়ে গেলাম। কাউকে কিছু বলতে পারলাম না। জুলেখার বাবাকে ফোন করে পেলাম না। তার বাড়ীতে চলে গেলাম পরদিন। তিনি স্বীকারই করলেন না যে তার মেয়ের কোন সমস্যা আছে। আশে পাশের মানুষের সাথে কথা বলতে জানলাম, ঐ জ্বীন তার শরীরে অনেক দিন ধরেই আছর করেছে। খবর নিলেই জানতে পারতাম।

"জুলেখা তার কামরায় দরজা বন্ধ করে বসে থাকল পরদিন। আমি আমার বাবা-মাকে সব খুলে বললাম। তারা সাথে সাথে ওঝা ডাকার প্রস্তাব দিলেন। জ্বীনের ওঝাদের কান্ড কারখানা আমি দেখেছি। অমানবীয়ভাবে মার ধোর করে। ভেতরে যেই থাক, শরীরটা তো জুলেখার। আমার মন সায় দিল না। ভাবলাম আরোও দু' একদিন দেখি। অনেকে বলে জ্বীন বেগতিক দেখলে অনেক সময় নিজের থেকেই চলে যায়। আশায় বুক বাঁধলাম। ওর পাশের একটা ঘরে রাত জেগে কাটাব বলে সিদ্ধান্ত নিলাম। ভয় ছিল বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেয় কিনা। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানিও না। মাঝরাতে হঠাৎ চীৎকার চেঁচামেচি শুনে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলাম। দেখি দোতলার বারান্দায় আমার মাকে দুই হাতে শূন্যে তুলে দাঁড়িয়ে আছে চাঁদনী। আমাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, '*দেব নীচে ফেলে? মাকে চাস? যদি চাস তাহলে আমাকে কালই বাড়ী পাঠাবি। বল পাঠাবি!*' বাবা ছুটে এসে তার কাছ থেকে মাকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলেন। এক হাতে একটা ধাক্কা দিয়ে তাকে বিশ ফুট দূরে ছুড়ে দিল। বাবা কোমরে খুব ব্যাথা পেয়ে মেঝেতে শুয়ে কঁকাতে লাগলেন। বাড়ীতে কাজের লোক ছিল দু' জন, দারোয়ান ছিল একজন। তারা ছুটে এল। সিঁড়ি বেয়ে উপরেও উঠতে পারে নি। তার আগেই বুক চেপে ধরে মাটিতে আছড়াতে লাগল। বুঝলাম এ সাক্ষাৎ শয়তান। পরদিন সকালেই তাকে তিন তালাক দিয়ে তার বাবার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলাম।"

আসলাম থামল। রহমত বলল, "তারপর আর জুলেখা ভাবীর সাথে আপনার দেখা হয়েছে?"

মাথা নাড়ল আসলাম। "প্রশ্নই আসে না। তবে জুলেখার জন্য আমার খারাপ লাগে। একটা শয়তান জ্বীনের কারণে তার সমস্ত জীবনটা একটা দুঃস্বপ্ন হয়ে গেছে। ওর জন্য আমার দূর্বলতা অনেক দিন ছিল। কিন্তু অন্য জায়গায় বিয়ে করে আবার সংসার পাতি। ছেলেমেয়ে হয়েছে। নতুন বউ সবই জানে। এসব নিয়ে আমি একবারেই আলাপ করি না। কি দরকার?"

আসলাম দুপুরে না খাইয়ে ছাড়ল না। তার জন্য আবার মুর্গী জবাই করে, পুকুর থেকে মাছ তুলে প্রচুর রান্না বান্না করা হল। সময় নষ্ট হল কিন্তু তাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করল না রহমত। অতিথিপরায়ণ মানুষ এরা, বাঁধা দিলে অসম্মান করা হয়।

আসলামের বাড়ী থেকে বের হতে হতে বিকেল হল। আসলাম নিজেই তাকে বুদ্ধি দিল জুলেখার বাবার বাড়ীতে গিয়ে একবার ঢু মারতে। সেই বাড়ীতে এখন জুলেখাদের কেউ থাকে না, কিন্তু তারপরও কারো না কারো সাথে দেখা হয়ে যেতে পারে। জুলেখাদের আত্মীয়স্বজনেরা এখনও অনেকেই আশে পাশেই থাকে। তারা হয়ত রহমতকে নতুন কোন তথ্য দিতে পারে। আসলাম নিজে কৌতূহলী হলেও এসবের মধ্যে আর জড়িয়ে পড়তে চায় না। তার নতুন বৌ ব্যাপারটা খুব ভালো চোখে দেখবে না।

রহমত হিসাব করে দেখল সূর্য ডুবতে এখনও ঘণ্টা দুই বাকী আছে। জামালপুরে জুলেখাদের বাড়ী যাবে কিনা ভাবছে সে। পরিত্যাক্ত বাড়ীতে গিয়ে অন্ধকারে আটকে পড়তে চায় না। পথ ঘাট চেনে না। এমনিতেই মনে মনে সে যথেষ্ট ভয়ে আছে। জ্বীন-পরীতে তার বিশ্বাস থাকুক আর না থাকুক, সে কোন ঝুঁকি নিতে আগ্রহী নয়। জুলেখার আগে সে কখন এই ধরণের কেস দেখেনি। কোন সম্ভাবনাই সে অবহেলা করতে চায় না। কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে গিয়েই বা কি করবে? শেষ পর্যন্ত যাওয়াই ঠিক করল। অন্তত পক্ষে জায়গাটা দেখে যাবে। পরদিন আর খুঁজতে হবে না।

জামালপুর বাজার থেকে উত্তরে দুই কিলোমিটার যাওয়ার পর একটা জংলী জায়গা নজরে পড়ল। বড় বড় আম গাছ এবং অন্যান্য কিছু স্থানীয় গাছে ভেতরের ইঁটের বাড়ীটা প্রায় নজরেই পড়ে না। একটা মাটির রাস্তা ভাঙ্গা লোহার গেট পেরিয়ে ভেতরে চলে গেছে, লম্বা ঘাসে ছেয়ে গেছে চারদিক। রাস্তাটা পেরিয়ে যাবার পর লাল ইঁটের বাড়ীটা লক্ষ্য করল রহমত। গাড়ী ব্যাক করল। চারদিকে তাকিয়ে দেখল শুধু ফসলের মাঠ। আশে পাশে অন্য কোন বাড়ী নেই। কোন মানুষ জনও দেখল না। কি সমস্যা! এমন নির্জন একটা পরিত্যাক্ত বাড়ীতে একা একা যাওয়াটা ঠিক হবে? ভৌতিক অস্তিত্ব যদি নাও থাকে, অনেক সময় এই জাতীয় স্থান অপরাধীদের আস্তানা হয়ে পড়ে। গাড়ী থেকে নেমে চারদিকে তাকিয়ে মনে হল না কেউ সেখানে যায়। কোথাও কোন পায়ে চলার পথ দেখা গেল না। কি করবে ভাবছে রহমত। তার এখানে আসার প্রধান উদ্দ্যেশ্য ছিল মানুষ জনের সাথে আলাপ করা। বাড়ীর ভেতরে গিয়ে কি লাভ? পুরানো বাড়ী, ইট-পাথর খসে পড়ে ব্যাথা পাবারও সম্ভাবনা আছে। তারপরও এতদূর এসে একবারে কিছু না করে ফিরে যেতেও মন চাইল না। গুটি গুটি পায়ে ঘাসের জঙ্গল পেরিয়ে বাড়ীটার সামনের চত্বরে উঠে এলো সে। বুকের মধ্যে ধুক পুক করছে। কাউকে সাথে নিয়ে এলে ভালো হত। সাহস পাওয়া যেত। সদর দরজায় আস্তে ধাক্কা দিতে শব্দ করে খুলে গেল সেটা। চমকে এক পা পিছিয়ে এসেছিল রহমত। আপনমনে হাসল। এতো ভয় পাবার কি হয়েছে? পা বাড়িয়ে ভেতরে ঢুকল। যা ভেবেছিল তার চেয়ে পরিষ্কার ভেতরে। ধুলার আস্তরণ চারদিকে কিন্তু আবর্জনা নেই। পাশাপাশি অনেকগুলো ঘর। আরেকটা দরজা দিয়ে পেছনের আঙিনায় চলে এলো। চমৎকার দৃশ্য। সামনেই বিশাল এক দিঘী। বাঁধানো ঘাট। পুকুরের চারদিক ঘিরে সারি বেঁধে আরও অনেকগুলো আম গাছ। নানান আকারের। শেষ বেলার আলোতে পানিটা খুব সুন্দর লাগছে। ঘাটের দিকে এগিয়ে গেল রহমত, খেয়াল করল না মাত্র ফুট পঞ্চাশেক দূরে, বাড়ীটার অন্য প্রান্তের একটা লাগোয়া বারান্দায় দু' জন গ্রাম্য মহিলা তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

ঘাটের বাঁধান চত্বরে মাত্র পা রেখেছিল রহমত, পেছনে গলা খাঁকারীর শব্দ শুনে চমকে তাকিয়ে দু'জন লুঙ্গী পরা লোককে তার দিকে প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত চেয়ে থাকতে দেখে তার প্রায় হার্ট এটাক হবার জোগাড় হল। একটু দূরে মহিলা দু'জনাও মাথায় ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে আছে। চার জোড়া চোখ তার দিকে তাক করে আছে, অচেনা, অজানা মানুষ, একটা পরিত্যাক্ত ভৌতিক বাড়ীতে – রহমতের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কি করবে সে? কি বলবে? এরাই বা কারা?

"কাকে চান?" একটা লোক প্রথম কথা বলল। তার বয়েস ত্রিশের বেশী হবে না। তার

সাথীর বয়েস হয়ত আরো কিছু কম হবে।
তার মানবীয় কণ্ঠ শুনে যেন খানিকটা আশ্বস্ত হল রহমত। গলার কাঁপুনী যতখানি সম্ভব লুকিয়ে বলল, "এটা কি জুলেখাদের বাড়ী?"
লোকটা কিছু বলার আগেই পেছন থেকে মহিলাদের একজন বলল, "জুলেখা তো এইখানে থাকে না। ফাঁকা বাড়ী। জুলেখা বিয়ে করে কানাডা চলে গেছে।"
রহমতের সাহস ফিরে এসেছে। তার মাথাও কাজ করছে। প্রথমে, এদের পরিচয় জানা দরকার। তারপর দেখতে হবে তারা কোন নতুন কিছু বলতে পারে কিনা। জিজ্ঞেস করতে জানা গেল তারা জুলেখার দুঃসম্পর্কের আত্মীয়। বাড়িটা ভুতের বাড়ী হয়ে যাচ্ছে দেখে এখানে এসে বাস করছে। দেখে শুনে রাখে। রহমত ধারনা করল এরা নিশ্চয় গরীব। সুযোগ পেয়ে একটু ভালো জায়গায় এসে থাকছে। মনে হয় পেছনের মাঠ দিয়ে যাতায়াত করে, ফলে সামনে কোন চলাচলের চিহ্ন নেই। বোঝা গেল, পরিত্যাক্ত হলেও সেখানে তাদের এভাবে বাস করাটা যে আইনসংগত না হতে পারে, সে ব্যাপারে তারা অবহিত এবং শঙ্কিত। রহমত তাদেরকে আশ্বস্ত করল। সে কিছু খবর চায়। তার আর কোন উদ্দ্যেশ্য নেই। নিজের সত্যিকারের পরিচয় দিল সে। তারা চারজনই এক বাক্যে স্বীকার করল, জুলেখার যখন বুড়া লোকটার সাথে বিয়ে হল, তখনই তারা জানত একটা সমস্যা হবে। জেনেশুনে জ্বীনের আছর আছে এইরকম একটা মেয়েকে কে বিয়ে করবে? তার প্রথম বিয়ের সময়েও তারা জানত কিছু একটা ঝামেলা হবে। এক সপ্তাহও যায় নি, জুলেখাকে বাড়ী ফিরে আসতে হয়েছিল। তারা অবশ্য নতুন কোন কিছু জানাতে পারল না, কিন্তু একটা উপকার করল। জুলেখার বাবার বাড়ীতে একজন বয়েসী মহিলা অনেক দিন কাজ করেছিল। বিধবা। কোন ছেলেমেয়ে ছিল না। জুলেখার বাবা-মা মারা যাবার পর, জুলেখার সাথে সেও নানীর কাছে গিয়ে থাকত। সে আজও বেঁচে আছে এবং হয়ত রহমতকে নতুন কোন খবর দিতে পারবে। বুড়ীকে কোথায় পাওয়া যাবে জেনে নিয়ে বিদায় নিল রহমত। এখানে আসাটা একেবারে ব্যার্থ হয় নি। কোথা থেকে কি তথ্য পাওয়া যাবে, কে বলতে পারে? বুড়ী হয়ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু জানে। ইতিমধ্যেই সূর্য ডুবতে শুরু করেছে। আজ আর গ্রামে ঘোরাঘুরি না করারই সিদ্ধান্ত নিল রহমত। পরদিন ফিরে এলেই হবে। বুড়ীকে খুঁজে বের করতে সমস্যা হবে কিনা সে ঠিক বুঝতে পারছে না।